

স্মৃতিতে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট

টুঙ্গীপাড়ার গণবনবিখ্যার ছায়াতলে ঘুমিয়ে আছো বাংলার প্রিয় জনক শেখ মুজিব.....

সদেরা সূজন

১৯৭৫। সবেমাত্র প্রাইমারী স্কুলের গডি পেরিয়ে হাইস্কুলে পদার্পন করেছি। বেশ ভালোই লাগছিলো হাই স্কুলের ছাত্র হিসেবে। বাবা, বড়ভাই-বড়বোন সবাই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তখন আমাদের এলাকায় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় বড় দু'বোন একই স্কুলের মেট্রিক পরীক্ষার্থী এবং ছাত্রলীগের স্কুল শাখার নেত্রী। দিনটি ছিলো শুক্রবার। ১৬ আগস্ট। খুব ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে স্কুলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তখন শুক্রবার মানে হাফ স্কুল। জুম্মার নামাজের জন্য সকাল আটটায় স্কুল শুরু হতো আর সাড়ে এগারটায় শেষ হয়ে যেতো। স্কুলে যাবার পূর্বমুহুর্তে বাবা বললেন স্কুলে না যাবার জন্য। কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখলাম বাবার বিষন্ন মুখে স্বজন হারানোর বেদনায় আপ্তত। তিনি কাঁদছেন, রেডিওর সংবাদ শুনছেন আর রেডিওটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন। যদিও প্রথমে স্কুলে না যাবার নির্দেশ শুনে আনন্দে মেখে উঠেছিলাম। কি মজা, স্কুলে গিয়ে স্যারের ধমক খেতে হবে না। সারা দিন বাঁধনহীন মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরবো সারা গ্রাম, সহপাঠী আর বন্ধুদের নিয়ে থাকবো খেলায় মত্ত। কিন্তু একটু পরেই যখন দেখলাম সারা গ্রামের পুরুষমানুষ আমাদের বাড়িতে সমবেত হচ্ছেন, এবং খুবই নীচু কাঁপা কাঁপা স্বরে সেই ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ আর আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। মা আমাকে বললেন বাড়ি থেকে না বের হবার জন্য। দেশে হয়তো আবার গন্ডগোল (সংগ্রাম) লেগে যেতে পারে। বাবাসহ গ্রামের অনেক মানুষের ক্রন্দন আর বিমর্ষতায় কৈশোরের চোখেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে দেশে একটি বড়রকমের অঘটন ঘটে গেছে।বাংলাদেশের প্রধান প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার সেই শৈশবের চোখে দেখেছি ১৯৭১ সালের সংগ্রাম, দেখেছি হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ, মনে আছে শরণার্থী ক্যাম্পের দিনগুলোর কথা। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কতো মিছিল কতো মিটিং। ১৯৭১ সালে ছোট-বড় সবাই দেখেছে শেখ মুজিব আর নৌকার জয়জয়কার। এছাড়াও শুনিয়েছিলাম বড়ভাই আর বাবার মুখে বঙ্গবন্ধুর কতো কথা। বঙ্গবন্ধু মিটিং করতেন তখন আমার বড়ভাই নেতা হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক সভায় যাবার সুযোগ হতো আর বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কতো গল্প ভাইবোনরা অপলকদৃষ্টিে বড়ভাই'র ভালো করে রাজনীতি বুঝতাম না। ক্লাসের বড় ভাইবোনদের সঙ্গে কিংবা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' বলে শ্লোগান মিছিল করতাম। সকাল বেলা বাবার পার্শ্বে বসে বড়দের চোখে পড়েছিলাম।



যখন সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় শ্রীমঙ্গল কলেজের ছাত্রলীগের বাহিনীর কর্মী হয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সেখানে যেতেন এবং বাড়িতে এসে করতেন আর আমরা অন্যান্য কথা শুনতাম। যাক ১৯৭৫ সালে শূণ্য মাঝেমধ্যে স্কুলের উপরের শহীদ মিনারে প্রভাত ফেরীতে র্যালীতে অংশগ্রহণ করে 'জয় দিয়ে বড়দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাতাম, বাড়িভরা মানুষ আর ভয় ভয় চোখে জল দেখে নিজেও আতঙ্কিত হয়ে

আমার কৈশোরের চোখে দেখা সেই ৭৫-এর অভিশপ্ত ভোর বেলার কথা তখন এতো বেশীকরে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সেদিন ভয় ভয় চোখে কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট কণ্ঠে মাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম বাবা কেন কাঁদছেন। শেখ মুজিবতো আমাদের কোনো আত্মীয় নন, কিংবা গ্রামেরও কোন লোক নন তা হলে বাবা, গ্রামবাসী আর বড় বোনরা কাঁদছে কেন, আমাদের বাড়িতে এত মানুষ সমাগম হচ্ছে কেন? মা বলেছিলেন 'ও তুমি বুঝবে না-বড় হলে বুঝবে, শেখ মুজিবের জন্য সারা দেশের মানুষ কাঁদছে নীরবে নিভৃতে, শেখ মুজিব সবার আত্মার আত্মীয়, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন বড় নেতা।'

না, সেদিন জাতির জনক হত্যার বিষয়টি ভালো করে না বুঝলে কয়েক বছর পরই বুঝতে অসুবিধা হয়নি ১৯৭৫-এর সেই কালো রাতে কি ঘটেছিলো বাংলাদেশের মাটিতে। কী ভয়াবহ কলংকজনক ঘটনা ঘটেছিলো বাংলাদেশে, কী

ভয়ানক ধ্বংসের মাতমে স্তম্ভ হয়ে গিয়েছিলো মানুষের ভাষা, স্তম্ভিত বাকবৃন্দ হয়েছিলো গোটা দেশবাসী সেই অবিশ্বাস্য-অভাবনীয়-অকল্পনীয়-অচিন্তনীয় এই নিষ্ঠুরতম, নৃশংসতম, বিভীষিকাময় বর্বরোচিত ও মর্মস্পদ নারকীয় হত্যায়ত্রে। কীংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মানুষ ছিলো বিপন্ন ভারাক্রান্ত জনক হারানোর শোকের মাতমে স্তম্ভিত। মনে আছে ১৫ আগস্টের ২/৩ দিন পর স্কুলে গিয়ে দেখি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিস থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে অফিসের ভিতর কাঠের আলমারির পিছনে লুকিয়ে রেখেছেন। ৭৫-এর ১৫ আগস্টের পরপরই লোকার্জিত উই পোকার মতো ঝাঁক ঝাঁক স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক হয়েনা রাজাকার আলবদররা ইঁদুরের গর্ত থেকে বের হয়ে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পরেছিলো স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির উপর বিশেষ করে আওয়ামী লীগ আর সংখ্যালঘুদের ওপর। নির্বিচারে হত্যা-ধর্ষণ-সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হয়। বুঝে উঠার আগেই প্রশাসনের সকল ক্ষেত্র বদলে যায়, প্রশাসন শুরু করে দেয় স্বাধীনতার পক্ষের লোকদের ওপর নির্মম অত্যাচার। মনে আছে এখনো, স্কুলের পাশেই ছিলো সদর থানা, থানার ভিতরে ছিলো বিশাল একটি তমাল গাছ। সেই তমাল গাছে হাত-পা-চোখ বেঁধে কী মধ্যযুগীয় বর্বর নির্যাতন করতে দেখেছি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ক্যাপ্টেন পঞ্জু মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গফুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিধান দাসসহ অনেককেইকে। বড়ভাইর মুখ থেকে পরে শুনছিলাম শ্রীমঙ্গলের খ্যাতিনামা জননেতা পরবর্তীতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আওয়ামী লীগ নেতা ইসমাইল হোসেন ও শ্রীমঙ্গলের সাবেক পৌরসভা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহিমকে পুলিশ অমানুষিক নির্যাতন করে হাত পা ভেঙে দিয়েছিলো। এটা শুধু একটি এলাকার কথা তুলে ধরলাম এভাবে সারা দেশে আতংক সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগকে নিঃশেষ করার জন্য খুনিরা মেখে উঠেছিলো যা আজাবি চলছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মাত্র ৩/৪ দিনের পর দেখেছি আমাদের এলাকার নামকরা রাজাকার স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অসংখ্য সংখ্যালঘু মানুষের হত্যাকার অসংখ্য নারীর ধর্ষণকারী কুখ্যাত ত্রাস মুজিবুর রহমান কমরু মিয়া (পরবর্তীতে ইউপি মেম্বর)সহ আনোয়ার খান (পরবর্তীতে উপজেলা চেয়ারম্যান)দের উত্থান, দেখেছি তাদের আক্রমণে কী করে নির্যাতিত হয়েছিলো স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের। থানার পুলিশ অফিসার আর পুলিশের নির্যাতনের ভয়ে এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছিলো, তাদের অপরাধ ছিলো তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা। দেখেছিলাম কী করে রাতারাতি ভারত বিদেশী উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ড, ভারতীয় কোনো পণ্যের জন্য স্থানীয় হিন্দুদের বাসা-বাড়িতে তল্লাসির নামে নির্যাতন।

নিজের অজান্তেই সেই ১৫ আগস্টের ইতিহাসের ভয়াবহ কলংকিত সেই ভোর আমার বিবেককে দংশিত করেছিলো, আমার কৈশোর জীবনের দুঃসহ স্মৃতি আমাকে পীড়িত করে আমার মনে যে ক্ষত হয়েছিলো তা থেকেই আমাকে ধাবিত করেছিলো সেদিনের সেই শোককে শক্তি হিসেবে এগিয়ে যাবার ফলে ক্রমান্বয়ে বঙ্গবন্ধু ভক্ত হয়ে সত্যিকারের বঙ্গবন্ধু প্রেমিক হয়ে ছাত্র রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। এই রাজনীতি করতে গিয়ে জীবনের কতো সহস্র চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়েছে, স্বৈরাচার খুনি জিয়া-এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে জেল-জুলুম-অত্যাচার সহিতে হয়েছে। মৃত্যুর মুখোমুখি থেকে কতোবার বেঁচে গিয়েছি যা শরীরের অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন এখনো আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই দুঃসহ দিনগুলোর অতীত বিন্যাসে প্রবাসের এই কষ্টকঠিন সময়ের মাঝেও। ত্রিশ বছর হলো স্বাধীনতা বিরোধী বাংলাদেশের কতিপয় ভাষ্কর্তা সামরিক কর্মকর্তা তাদের অসং চরিত্র বাস্তবায়ন করার লক্ষে হাজার বছরের এই শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করলো, কিন্তু এই ত্রিশ বছরে আমরা কি পেলাম আর কি হারলাম তা এখন ভেবে দেখার সময়। কি অপরাধ ছিলো বঙ্গবন্ধুর? কি অপরাধ ছিলো বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের? কি অপরাধ ছিলো বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং অবুঝ শিশু সন্তান শেখ রাসেলের? বঙ্গবন্ধুর পুত্রবধূ নববিবাহিতা যাদের হাতের মেহেদির রঙ মুছার আগেই ঘাতকের বুলেটে প্রাণ হারাতে হয়েছিলো সেই সুলতানা কামাল আর পারভীন জামাল রোজীর? কী অপরাধ ছিলো যুব নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর অন্তস্বস্তা স্ত্রী বেগম আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ আবু নাসের, আব্দুররব সেরনিয়াবাত, তাঁর মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, ছেলে আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত বাবু, ভাতিজা শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার কর্ণেল জামিল উদ্দিন আহমেদ ও আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে আব্দুল নঈম খান রিন্টুর? ৭৫'এর ১৫ আগস্টের কালো রাতে মানুষ নামের হয়েনারা একটি দেশের জন্মদাতাকে সপরিবারে হত্যা করে শুধু নিজেরাই কলঙ্কিত হয়নি, কলঙ্কিত করেছে সারা বিশ্বে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আর এই কলঙ্কের পাহাড়সমান বোঝা কাঁদে নিয়ে আমরা প্রবাসে বসবাস করছি। কিন্তু যেসব খুনীরা জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করেছে তারা কি সবাই ভালো আছে? গুটি কয়েক ক্ষমতায় আহরণ করলেও অধিকাংশই এখন নির্বাসিত, ফাঁসির মুখোমুখি। বঙ্গবন্ধু হত্যার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী দানব খন্দকার মুশতাক মৃত্যুর পূর্বে চোখে দেখিনি, অনুগ্রহন করতে পারিনি, এই মানবরূপি পশুর মৃত্যুতে কেউ দুঃখ প্রকাশ করেনি এমনকী কেউ জানাজাতে যায়নি, পত্র-পত্রিকায় তার মৃত্যুতে একটি বিশ্বাসঘাতক খুনির মৃত্যু হয়েছে বলে শুধু ঘৃণা আর ধিক্কার জানিয়েছে। আর বঙ্গবন্ধুর হত্যার অন্যান্য আসামী যারা ১৫ আগস্টের কালোরাতে যখন সারা দেশবাসী গভীর ঘুমে নিমজ্জিত ঠিক তখনই এরা হত্যা করেছিলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে। এই ২৪ জন খুনী হলো কর্ণেল সৈয়দ ফারুক রহমান অনারারী, ক্যাপ্টেন আব্দুল ওয়াহাব জোয়াদার, কর্ণেল (অবঃ) মুহিউদ্দীন, কর্ণেল (অবঃ) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, তাহের

উদ্দিন ঠাকুর, জোবায়দা রশিদ, লেঃ কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম, মেজর (অবঃ) বজ্রলুল হুদা, লেঃ কর্নেল (অবঃ) আব্দুল আজিজ পাশা, লেঃ কর্নেল (অবঃ) নূর চৌধুরী, মেজর (অবঃ) একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ, দফাদার (অবঃ) মারায়ত আলী শাহ, মেজর (অবঃ) আহমেদ শরিফুল হোসেন, লেঃ কর্নেল এএম রাশেদ চৌধুরী, রিসালদার (অবঃ) কিসমত হাসেম, ক্যাপ্টেন (অবঃ) নাজমুল হোসেন আনসার, ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মজিদ, ও আবুল হাশেম মুধা। এসব নরঘাতকদের মধ্যে অনেকেই এখন জেলে, আবার কেউ কেউ যুগ যুগ ধরে প্রবাসে ইঁদুরের মতো পালিয়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছ থেকে দূরে থেকে জীবন বাঁচাচ্ছে। কারণ প্রবাসী তাদেরকে দেখলেই খুনী বলে ডাকে, সামাজিকভাবে বয়কট করে আবার কোনো কোনো খুনীকে প্রবাসীরা জুতাপেটাও করেছে। ফলে এসব খুনীরা দেশে বিদেশে সমাজচ্যুত। অন্যান্য খুনীদের মধ্যে কেউ বিদেশে চুরির দায়ে জেলখাতে দেশে পাঠানোর পর জেলের ভিতরে পড়ে মরছে। ৭৫-এর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর পরবর্তী খুনী সরকাররা তাদের এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে ইনডেমনিটির মতো বিশ্ববিবেকের বুকে লাথি মেরে তৈরী করেছিলো এক কালো আইন, খুনীদের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠ করে সম্মান দেখিয়েছিলো, কিন্তু তা বেশীদিন ঠিকে থাকেনি থাকতে পারেনি। খুনী সব সময়ই খুনী। যুগ যুগান্ত রে শতাব্দী থেকে সহস্র বছর ইতিহাসে খুনী হয়েই থাকতে হবে। আজো শত শত বছর আগে পলাশীর আত্মকাননে ডুবে যাওয়া বাংলার সূর্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা সবাই বলে, তাঁর হত্যাকারী সেই বেঈমান বিশ্বাসঘাতক খুনী মীরজাফর আর স্বজন সন্তান সন্ততি খুনীর উত্তরসূরী হয়েই জীবনযাপন করতে হচ্ছে, একইভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী খুনীদের স্বজন আর সন্তান সন্ততির পরিচয় এই বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন খুনীর উত্তর সূরী হয়েই ঘৃণা আর ধীকার নিয়ে থাকতে হবে। আজ বাংলাদেশে ইনডেমনিটির মতো একটি জঘন্য আইন বাতিল হলেও বঙ্গবন্ধু খুনীদের বিচার হচ্ছে হচ্ছেনা, এমন এক দেশ যে দেশে জাতির জনক হত্যাকাণ্ডের রায় প্রকাশ করতে বিচারকরা বিরতবোধ করে অথচো স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার আসামী দাঁড়িওয়ালা খচর রাজাকার মন্নারের পুত্রকে বাঁচাতে সারারাত বিচারক এজলাসে বসে থাকেন। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বর্বরতম নৃশংস পৈচাশিক নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক মৌলবাদী রাজাকার আর স্বৈরাচাররা গত ত্রিশ বছরের মধ্যে (পাঁচ বছর বাদে) ২৫ বছর ধরে দেশ পরিচালনা করে দেশকে একটি উগ্র মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে চিরতরে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা দেখেছি কী করে এসব ঘাতকরা ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস বিকৃত করেছে, কী করে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষকে হত্যা করেছে, কী করে বারবার ১৫ আগস্টের পুনরাবৃত্তি করেছে (২১ আগস্ট ২০০৪), কী করে স্বাধীন বাংলার স্থপতিকে নিজের কণ্টার্জিত দেশ থেকে নির্বাসন দিয়েছে। আজ বঙ্গবন্ধু কিংবা জয় বাংলা শ্লোগান দেশের সর্বক্ষেত্রে এক নিষিদ্ধ ফরমান।

প্রবাসের কষ্টকটিন সময়ে ৭৫-এর ১৫ আগস্টের সেই চিরন্তন অমলিন স্মৃতি আমাকে কাঁদায়। ১৪/১৫ বছর ধরে এই দিনে জাতীয় শোক দিবসে একান্ত নীরবে জাতির জনক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর প্রতি পারিবারিকভাবে শ্রদ্ধা জানাই, সিডিতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ বাঁজিয়ে শতাব্দির অমর কাব্যখানি পরিবারের সবাইকে নিয়ে কয়েকবার শুন। এদেশে জন্ম নেওয়া আমার সন্তানদের বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ সম্পর্কে বলি। আমার ঘরের শোকসহ দেয়ালে লাগানো বঙ্গবন্ধুর ছবিগুলো দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর মতো মহামানবের গল্প বলি। যে নেতার জন্ম না হলে হয়তো পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেতাম না, আজ আমরা প্রবাসের মাটিতে গর্ব করে বলতে পারতাম না, আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের দেশ, বাংলা আমাদের মাতৃ (আন্তর্জাতিক) ভাষা।

পারিশেষে বলতে চাই, যতই ইতিহাস বিকৃত হোক, যত বছরই খুনীরা ক্ষমতায় থাকুক, যতই মুখরা বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করে হীনমান্যতায় নিমজ্জিত হোক তিনিও (বঙ্গবন্ধু) যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাংলা ভাষা থাকবে, যতদিন পৃথিবীর চন্দ্র-সূর্য থাকবে ততদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন শতাব্দি থেকে হাজার লক্ষ বছর অনন্তকাল মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায়।

ত্রিশ বছর ধরে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, শতাব্দির মহামানব, টুঙ্গিপাড়ার ঘণ বনবিখীর ছায়াতলে, মধুমতি নদীর কলতানে ঘুমিয়ে আছেন বাংলার প্রিয় জনক শেখ মুজিব। তাঁর তিরোধানে সেই মাটি এখন বাঙালির তীর্থভূমি। বাঙালির হৃদয়ে তিনি আকাশের মতো ভালোবাসা আর মহা সাগরের মতো শ্রদ্ধা নিয়ে বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল, শতাব্দি থেকে শতাব্দি, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম।

মন্দিয়ল/ ১২.৮.২০০৫

সদেরা সূজন/ ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী

বঙ্গবন্ধুর ৩০তম শাহাদাত দিবস জাতীয় শোক দিবসে সদেরা সুজনের দূ

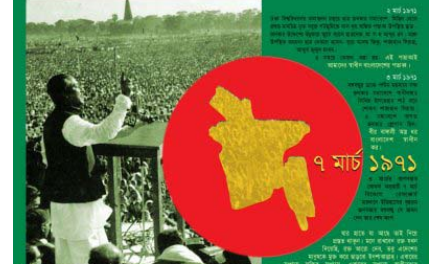
সেই কবে

সেই কবে-

বাবা আমাকে একটি কাগজ উপহার
দিয়ে বলেছিলেন-
স্বয়ং রেখে, যাতে হারিয়ে না যায়
কিংবা কখনো
ঘাতকরা ছিনিয়ে না নিতে পারে
সেদিকে কড়া দৃষ্টি রেখে
সুযোগ পেলেই ওরা ছিঁড়ে ফেলতে পারে।

আমি বাবার কথা রাখতে পারিনি
একদিন গভীর রাতে
আমি তখন ঘুমে- তাবৎ পৃথিবীটাই ঘুমে
সবার অলক্ষ্যে-
গভীর রাতের নীরবতা ভঙ্গ করলো
বিকট শব্দ আর লাখো মানুষের ক্রন্দনে
তখন কিন্তু জানিনে- বুঝতে পারিনি
ঘাতকের বুলেট বিশ্ব হয়ে পড়ে আছেন
আমার বাবা,
হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো তাঁর বজ্রকণ্ঠ
আকাশের মতো হৃদয় ভরা ভালোবাসা।

এক সময় দেখি
বাবার সমাধির পাশেই
বাংলার সবুজ ঘাসের উপরে
ছিঁড়ে পড়ে আছে সেই কাগজটি
লাল রক্তে অস্পষ্ট হয়ে গেছে
বাবার দেওয়া স্বাধীনতার
আসল দলিলটি।



আমার পরিচয় একটি ছবি একটি নাম

সেই কবে, যখন আমি বাংলার ঘাস-মাটি বৃক্ষ ছেড়ে
চলে আসি ভিন্ন দেশে
ছিলো একটি ছবি সবুজ পাসপোর্টের পাশাপাশি
বুক পকেটে পাজির ঘেসে, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যখন আমি চলে যাই শৈশব থেকে কৈশোরের
স্মৃতিঘেরা দিনে, এই মর্মবেদনার প্রবাসে-
তখন একটি নাম মিশে থাকে অস্তিত্বে অভিন্ন চিত্রে
বডুবেশী আপন হয়ে সুবিন্যাসে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যখন কষ্টকঠিন প্রবাসের পৃতিদিন যে ছবিটি
দেখি আমার শোকেসের আয়নায়
কিংবা দেয়ালে দেয়ালে প্রতিবিম্ব হতে,
যে ছবিটি ওয়াল ইউনিটের গ্যাস থেকে
আমাকে সাহস যোগায় দীপ্তপদে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যখন আমায় কেউ জিজ্ঞেস করে
কী আমার পরিচয়, কীইবা ঠিকানা?
কোথা থেকে এসেছি?
আমি তখন বলে দেই, স্বগর্বে একজন মানুষের নাম
একটি রক্তাক্ত মানচিত্রেরা ছবির গল্প..
একজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির কথা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মন্ডিয়ল ৯/৮/২০০৪